International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 400-420
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.235

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘ফুল ফুটুক’ পর্যায়ের কবিতায় গল্প বলার শিল্পকৌশল

ড. সৌরভ মজুমদার
প্রাক্তন গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Storytelling is one of the most ancient practices of humankind. Since the archaic form of literature was poetry, the medium of those stories – told through generations, were also various kinds of poems. The Epics, such as Ramayana or Iliad are practically stories told or written in the form of poems. Thus, storytelling through poems is a tradition that was followed all over the world. At the wake of Bengali literature, the Charyapadas also contained many stories weaved in a poetic form. The middle age of Bengali Literature, ‘Madhyayug’ consisted of Mangalkavyas and Vaishnava Padavalis, which also tried to tell stories of Gods, Human Rebellion or eternal love in a metric expression. This ongoing tradition of storytelling through rhythms apparently came to an end in Nineteenth Century, when the literary forms of Novel and Short Stories were introduced. The era of concocting literary epics like ‘Meghnadhbadh Kavya’ ended, grand stories disappeared from the rhythmic cage of poetry, and what the new ‘lyric poetry’ tried to express was the inner mechanisms of human mind in its smaller, condensed structure. These limitations of ‘lyric’ could not erase the eternal impulse of storytelling though. When lyric poems started to contain stories, the form of storytelling itself started to change according to the aesthetic of that specific literary body. The poems of Subhas Mukhopadhyay embodied that unyielding, generational spirit of satorytelling, while also providing a fitting format in which stories could be successfully adapted in lyrical structure.

Keywords: Subhas Mukhopadhyay, ‘Phool Phutuk’, Stories in poetry, Socio-political situation, Hegemony

বাংলা কাব্যধর্মী রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতিকা। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে রচিত এই গাথাগুলিতে তত্ত্বপ্রচারের প্রবণতা মুখ্য হলেও, বেশ কয়েকটি চর্যার সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে একটি গল্পের আভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় টেণ্টণপাদ রচিত ৩৩-সংখ্যক চর্যাটির—“টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।”[১] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—“ইহার তাৎপর্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট গভীর অর্থবহ সন্দেহ নাই; কিন্তু দারিদ্র্যক্লিষ্ট গৃহিণীর বিড়ম্বিত জীবনটি স্বল্পতম রেখার সাহায্যে ছোট গল্পের উপাদানে পরিণত হইয়াছে।”[২] মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যধারাটি মূলত ধর্মীয় আখ্যানের স্রোতে বাহিত—যেখানে কাহিনিই মুখ্য, কাব্য কেবল শ্রুতি-সহায়তার মাধ্যম-মাত্র। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় হরপ্রসাদ মিত্রের বক্তব্য—নারায়ণদেবের ‘পদ্মাপুরাণ’- এ চাঁদ সদাগরের নৌকাডুবি-জনিত দুর্দশার বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি জানান:

> বস্ত্রহীন চন্দ্রধরের দুর্দশা বর্ণনার দায়িত্ব নিয়ে নারায়ণ দেব এখানে যথাসাধ্য বস্তুবর্ণনা করেছেন। গল্পের দিকেই তাঁর সর্বাধিক মনোযোগ,—কারণ, প্রধানতঃ গল্পই তিনি বলতে বসেছেন। সেই গল্পের ধারাতেই চন্দ্রধরের দুর্দশা দেখা দিয়েছে এবং কবি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কল্পনার সাহায্যে যা বর্ণনা করেছেন তাতে ব্যক্তিবিশেষের দুর্দশাটুকুই ফুটেছে,—সেই সূত্র ধরে কোনো সীমাহারা, সর্বজনীন দীর্ঘশ্বাস প্রকাশের অভিপ্রায় ঘটেনি।[৩]

মধ্যযুগের অবসানে দৈব-কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সাহিত্য ক্রমশ মানবকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী হয়ে উঠতে থাকলে খণ্ডকবিতা তথা গীতিকবিতার চর্চা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু মন্ময়তার আধিক্যে ও প্রকরণগত অনমনীয়তায় তাতে সার্থক গল্প পরিস্ফুটনের অসামর্থ্য দেখা দেয়। মধ্যযুগীয় কাব্যের সমস্যা ছিল গল্পের আধিক্য, কিন্তু ইংরেজ-আগমন-পরবর্তী বাংলা কবিতায় দেখা গেল গল্পের অভাব। বস্তুত, কেজো চিঠিপত্র ও তত্ত্বালোচনায় সীমাবদ্ধ বাংলা গদ্যচর্চার ফল্গুধারাটি যখন ছাপাখানার আবির্ভাবে ও বৈদেশিক প্রেরণায় স্বয়ম্ভর হয়ে উঠল, তখন থেকে কাব্যিক শৈলীতে গল্প বলার প্রয়োজনীয়তা ফুরাল। সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর অভাবে রক্তাল্পতায় ভুগতে থাকা কবিতাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হিসেবেই দেখা যেতে পারে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদলে সর্গবদ্ধ আখ্যানকাব্য রচনার ক্রমব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলিকে। রাজস্থানি কল্প-ইতিহাসের কাব্যীকরণ ('পদ্মিনী উপাখ্যান'), পৌরাণিক কাহিনির পুনর্নির্মাণ ('তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'বৃত্রসংহার কাব্য', 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্র'-'প্রভাস' ত্রয়ী), কিংবা অদূর-অতীতের ঐতিহাসিক সত্যকে কাব্যিক ভাবালুতায় পুনর্বয়ন ('পলাশীর যুদ্ধ') ইত্যাদি সমসময়-অভিনন্দিত প্রচেষ্টার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমী নির্মাণ-রূপে কালোত্তীর্ণতায় সম্মানিত হল মহাকাব্যের মানবতাবাদী পুনর্বয়ন-রূপী 'মেঘনাদবধ-কাব্য'—কিন্তু এই রূপাবয়বের কোনো সার্থক উত্তরসূরী পাওয়া গেল না। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের কলমে উপন্যাসের পৃথক ধারাটির সবিক্রম উত্থানের পর কবিতায় বিবরণধর্মী আখ্যান-নির্মাণের এই প্রবণতার অবসান হল। দেশ-দশের জীবন-প্রসারী বৃহদায়তন কাহিনি—যা উপন্যাসের মৌল উপজীব্য—তার সঙ্গে কবিতার জল-অচল বিভাজনটি এভাবেই সম্পন্ন হল। মার্কিন সাহিত্যিক Edgar Allen Poe তাঁর 'Review of Hawthorne's Twice-Told Tales' (গ্রাহামস ম্যাগাজিন, মে ১৮৪২) প্রবন্ধে কবিতা ও গল্পের মধ্যে তুলনা টেনে দেখান, কবিতায় সুন্দরের জয়যাত্রা মুখ্য, কিন্তু তার ছান্দিক কৃত্রিমতা যুক্তিনির্জিত সত্যের আবাহনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়— যে সত্য গল্পের প্রধান অবলম্বন—

> We have said that the tale has a point of superiority even over the poem. In fact, while the rhythm of this latter is an essential aid in the development of the poem's highest idea—the idea of the Beautiful—the artificialities of this rhythm are an inseparable bar to the development of all points of thought or expression, which have their basis in Truth. But Truth is often, and in a very great degree, the aim of the tale. [৪]

গল্পের 'সত্য'- নির্ভরতা আর কবিতার 'সুন্দর'-কে যথাযথতায় মিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের হাতেই সূচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'পুরাতন ভৃত্য', 'দেবতার গ্রাস', 'দুই বিঘা জমি' কিংবা 'কথা'-'কাহিনী'-র কবিতাগুলিতে গল্প বলার প্রবণতাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'লিপিকা'-র কাব্যপ্রতিম গদ্যরচনাগুলিতে গল্পের বিস্তারকে ছাপিয়ে কাব্যিক ঘনসংবদ্ধতার দিকে যাত্রা হয়েছে মুখ্য। 'পুনশ্চ'-র গল্পভিত্তিক কবিতাগুলিতে গদ্যছন্দ ও চলিত ভাষা ব্যবহারের স্বেচ্ছাবৃত আয়াসে কাব্যিক কৃত্রিমতার আবরণ ছিন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা' প্রবন্ধে কাব্যনাট্যের কাব্যধর্ম ও নাট্যধর্মের

যে অচিন্ত্যভেদাভেদ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছিলেন অশ্রুকুমার সিকদার, গল্পভিত্তিক কবিতাতেও অনুরূপ একটি সৌষম্যে পৌঁছনোর চেষ্টা থাকে বলেই মনে হয়—

> কাব্যনাট্যকে নাটক হওয়ার পরেও কাব্য হতে হয়। ঘটনা গতি উৎকণ্ঠা বিস্ময় এই সব নাটকীয় গুণ যেমন থাকবে, তেমনি ঘটনা চরিত্র ভাষাকে কেন্দ্র করে তারই মধ্য দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় তাৎপর্যও পুষ্পিত হবে কাব্যের মতো। কাব্যনাট্যে বস্তুমরীচিকার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে কবির দিব্যদৃষ্টি, কবির ধ্যান। কাব্যনাট্যকে দুই হিসেবে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হয়— একদিকে জীবনের নাটকীয় সংঘাতের চিত্র হিসাবে, অন্যদিকে কবির দিব্যকল্পনার প্রতীক হিসাবে।... কাব্যনাট্য (নাটকের) সেই দিনানুদিনের স্তরে থাকে না, তাকে উঠতে হয় ধ্যানময় সত্যের স্তরে, স্থায়ী উপলব্ধির অতিমর্ত্য জগতে।[৫]

এই সংজ্ঞা অনুসরণ করে বোধহয় বলা যায়, গল্পভিত্তিক কবিতাতেও 'বস্তুমরীচিকার ভিতর দিয়ে... কবির দিব্যদৃষ্টি, কবির ধ্যান' পরিস্ফুট হয়ে উঠতে হবে। গল্পের দিনানুদৈনিকতার বস্তুভিত্তিকে তা অস্বীকার করবে না, কিন্তু সেটুকুতেই সে সীমাবদ্ধও থাকবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্প এবং 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় প্লটগতভাবে বিশেষ তফাত নেই— একটি আপাত-বর্জনীয় মানবসম্পর্কের অপরিহার্য্যতার অনুভবই উভয়েরই মূলগত ভাব। কবিতাটিতে ছন্দোময়তার কারণে শ্রুতিমাধুর্য এবং গতিময়তার বেশি বিশেষ কোনো কাব্যধর্মের ছোঁয়া পাওয়া যায় না, বরং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ক্ষেত্রটিতে কবিতাটি গল্পের তুলনায় অনেকাংশেই ঊন। স্পষ্টতই, গল্পভিত্তিক কবিতা কেবলই ছন্দে-গ্রথিত গল্প হবে না— তাকে কবিতাও হয়ে উঠতে হবে, যেখানে গল্পের আধারে কবির নিজস্ব জীবনদৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। পাশাপাশি, বিবরণমূলকতার জঞ্জাল পেরিয়ে সে কবিতা খুঁজে নেবে প্রয়োজনীয় নীরবতার পরিসর— বহুবাচনের তুলনায় যে হিরণ্যগর্ভ নীরবতা কবিতাকে দেয় তার কাঙ্ক্ষিত প্রসারতা ও গভীরতা। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে 'আধুনিকতা'-র আবির্ভাবে বাংলা গীতিকবিতা যখন রোম্যান্টিক তারল্য তথা ভাবাবেগের প্রাবল্য পরিহার করে ক্রমশ ক্লাসিকধর্মী হয়ে উঠল, হল ভূয়োদর্শী-বহুপাঠী কবিদের বক্তব্যের মাধ্যম— তখন থেকেই কবিতায় গল্পের মুখরতা ও কাব্যিক নীরবতার সৌষম্যে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' এই প্রচেষ্টার নিদর্শন, যেখানে মন্তাজের মতো কয়েকটি দৃশ্যের অবতারণা একটি গল্পকে অবয়ব দিয়েছে, কিন্তু নিহিত নীরবতা ও উল্লম্ফন-প্রক্রিয়ার প্রয়োগে কাব্যিক ব্যঞ্জনার উৎসার ঘটেছে কালাতিশায়ী সার্থকতায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গল্পধর্মী কবিতাগুলিতেও নীরবতার প্রয়োগ লক্ষণীয়— তার সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হয়েছে একটি বিমূর্ততার আঙ্গিক। আধুনিক বাংলা কবিতার 'দ্বিতীয় পর্যায়ে', বিশ শতকের চারের দশকের কবিদের মধ্যে গল্পভিত্তিক কবিতারচনার একটি নিজস্ব ধারা নির্মাণ করে নিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর এইজাতীয় কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'ফুল ফুটুক', 'যত দূরেই যাই', 'কাল মধুমাস' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে—যে পর্বটিকে তাঁর কাব্যচর্চার সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় পর্যায় বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। মার্কসবাদী ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী কবি সুভাষ তাঁর গল্পমুখ্য কবিতাগুলিতে নিজস্ব জীবনদৃষ্টির পাশাপাশি মতাদর্শগত দায়বদ্ধতারও স্বাক্ষর রেখেছেন— ফলত তাঁর কবিতায় সংযোজিত হয়েছে একটি নতুন মাত্রা, যা তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের কবিতায় পাওয়া যায়নি।

বাংলা কাব্যজগতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবির্ভাবকাল থেকেই ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিগত আবেগের বুর্জোয়া সংকীর্ণতা তাঁর কাছে সর্বথা পরিহার্য— তাই বর্জনীয় সেই আবেগের রূপদানকারী গীতিকবিতার বিলোল অবয়বও। মার্কসীয় ভাবনায় দীক্ষিত এই কবি কবিতাকে শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করেছেন কাব্যচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে—তাই কখনো তাঁর স্বর বিরুদ্ধ-মানসিকতার বুর্জোয়া চিন্তকদের কৃতকর্মের প্রতি ব্যঙ্গে ক্ষুরধার ("অহিংসার ট্রেডমার্কা অচল এবার।/ দেশভক্তি আমাদের সওদাগরী চাল": 'গ্রীনরুমে'/ পদাতিক), কখনো বা জনযুদ্ধের আবাহনের শঙ্খনাদে মুখর—

ঋণগ্রস্ত চাষীদের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ যোগালো
বিষম বিক্ষোভ, তাই
লাঙলে কাটে না মাটি দুর্বল দুহাতে শ্লথ মুঠি।
বস্তির গলিত প্রান্তে ওঠে হাঁই—
অসহায় জীর্ণ ঘরে উপবাসী মৃত্যুর ভ্রূকুটি।
কোটি কণ্ঠে গান স্তব্ধ; নিরুদ্যম নিস্তেজ ধমনী—
অবরুদ্ধ ক্ষমতার খনি,
এখনো নিষ্ক্রিয় বসে আছো?
নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকো, রক্তে তার জ্বলুক আগুন;
শৃঙ্খলিত সেনাপতি, শূন্য আজ তূণ।। ('আহ্বান'/ ঐ)

'পদাতিক', 'অগ্নিকোণ', 'চিরকুট' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে মূলত এই দুটি প্রবণতাই প্রধান, কিন্তু 'ফুল ফুটুক' থেকে কবি সুভাষ সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির বিলোপের পরিবর্তে ব্যষ্টিকে সমষ্টির প্রতিনিধিরূপে তুলে ধরতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। অশ্রুকুমার সিকদারের ভাষায়, " 'ফুল ফুটুক' কবিতাপর্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিজীবনের ইতিহাসে মানবতাবাদের উজ্জীবনের কাব্য।"[৬] বস্তুত, 'ফুল ফুটুক' থেকেই শ্রেণিচেতনায় সমৃদ্ধ, নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতিময়, 'লাল টুকটুকে দিন'-এর আবাহনের আশাবাদী সুরে পরিপূর্ণ অথচ প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলির মতো একান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়—এমন অনুভূতিনির্ভর কবিতা রচনার প্রবণতা দেখা দেয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর কবিতার এই পর্বান্তর বিষয়ে সুভাষের নিজের বক্তব্য এরকম—

> প্রথম দিকের কবিতায় তো পুঁথিপড়া বিদ্যেই প্রাধান্য পেয়েছে। ... আমার কবিতায় গোড়ায় যে রাজনীতি এসেছে তা পুঁথিপড়া বিদ্যা থেকে উঠে আসা। কিন্তু রাজনীতিতে এসে বুঝেছি, শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যেয় রাজনীতি করা চলে না। আর এ বিশ্বাসও রইল না যে, কবিতা দিয়ে রাজনীতি করা যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তখন বড় হয়ে উঠল। ... যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করিনি, তখনকার কবিতায় রাজনীতি তারস্বরে প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার মধ্যে একটা কোলাহল ছিল। আবার যখন রাজনীতিতে থেকেও কবিতার দিকে যাচ্ছি, তখন 'যত দূরেই যাই' পর্বের কবিতাগুলো তৈরি হয়ে ওঠে।[৭]

স্পষ্টত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তত্ত্বমুখ্যতা থেকে জীবনমুখ্যতার দিকে অভিযাত্রার মুখ্য প্রভাবক 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা'। প্রথম পর্যায়ের কবিতায় তিনি জীবনকে দেখেছেন দূর থেকে, তাঁর মননে মানুষ তখন দিনবদলের সৈনিকমাত্র— রক্ত-মাংসের উত্তাপে তারা ভাস্বর হয়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ফলে ক্রমশ ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে অপরিচয়ের দূরত্ব ঘুচে যেতে থাকলে সুভাষের কবিতায় পরিবর্তনের সোনালি রেখা ফুটে উঠতে থাকে। ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর দমদম জেলে কারারুদ্ধ হন সুভাষ,

সহবন্দিদের সঙ্গে ৪৭ দিনের অনশন ধর্মঘটের পর তাঁকে পাঠানো হয় বক্সা জেলে। সুদীর্ঘ আড়াই বছরের কারাবাস শেষে ১৯৫০-এর নভেম্বরে মুক্তিলাভ করে "১৯৫২ সালে সস্ত্রীক সুভাষ চলে যান বজবজে, ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের মজুর বস্তিতে, চটকল শ্রমিক মজদুর সংগঠনের কাজে। রাজনীতির তত্ত্ব এখানে এসে মেশে উষ্ণ মানবিকতায়..."[৮]। এই সুদীর্ঘ সময় সুভাষ মৌলিক কাব্যচর্চা থেকে বিরত ছিলেন। কারাবাসকালে "অনুরোধে-উপরোধে বড়জোর দুটো একটা অনুবাদ বা অনশন ধর্মঘটের গান" আর বজবজে অবস্থানপর্বে 'পেটের দায়ে' গদ্যরচনা লিখতে হয়েছে তাঁকে—কিন্তু অনুধাবন করা যায়, এসময়টি ছিল এক হিরণ্যগর্ভ প্রস্তুতিপর্ব। পরবর্তী রচনাপর্বের সমিধ তিনি সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন এই আপাত ঊষরকালে ক্রমস্তরিত জলদপ্রতিম স্মৃতিসম্ভারে। আর সেই কালো মেঘের রূপোলি পাড় থেকেই ক্ষরিত হল নবসৃজনের বৃষ্টিধারা—মানুষের অন্তরঙ্গতার মিঠে ছোঁয়াচ বদলে দিল সুভাষের কবিতার স্বাদ। কবিতায় মিছিলের বদলে বড় হয়ে উঠল ঘরকন্নার বিবরণ, শ্লোগানসর্বস্বতার যান্ত্রিকতা বদলে গেল চিত্রকল্পের অমোঘতায়, গল্পে-গল্পে কবিতায় ফুটে উঠল 'আস্ত মানুষের' অবয়ব। তাঁর নিজের ভাষায়,

> আমার প্রথম দিককার কবিতা ছাত্রবয়সে লেখা। তো তখন abstraction-টাই বেশি ছিল। কেন না মানুষ সম্পর্কে আমার ধারণা, অভিজ্ঞতা খুবই কম ছিল। এটা খানিকটা এলো যখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠল, জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। তারপর তো কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এলাম। পার্টির কাগজে লিখতে শুরু করলাম এবং সেই সূত্রেই শুরু হয় বাংলার গাঁ-গঞ্জে শিল্পাঞ্চলে ঘোরা। ... সাকুল্যে আড়াই বছর জেলে ছিলাম। তারপর বজবজে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকি। গল্পের ব্যাপারটা তখন থেকেই এলো। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তাদের জীবনের নানা সমস্যার কথাই আমার লেখায়, কবিতায় তুলে ধরেছি। ঠিক বানানো গল্প আমি কখনো লিখতে পারিনি। ... রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ভেতর দিয়েই আমি মানুষকে কাছ থেকে বেশি চেনার সুযোগ পাই। এবং এই অচেনা মানুষগুলোই আমার কবিতায় এসেছে।[৯]

"গোঁড়া রাজনীতিতে বিশ্বাস যখন শিথিল হয়ে এলো তখন ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে পুরাণপাখির মতো জন্মালো মানবতাবাদে গভীর প্রত্যয়"[১০]— সুভাষ অনুধাবন করলেন— "(কবিতায়) গভীরভাবে টানতে হলে মানুষের প্রতি চাই নাড়ির টান"[১১]। একদিকে মানবজীবন-স্পর্শে তাঁর কবিপ্রতিভা তত্ত্বসর্বস্বতার বন্ধন ছেদনে উন্মুখ হল, অন্যদিকে তুর্কি কবি নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ-প্রয়াস তাঁকে জোগালো স্বাতিক্রমণের প্রেরণা। সুভাষ জানিয়েছিলেন, "নাজিম হিকমতকে অনুসরণ করিনি। তাঁর ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনার একটা বড় মিল খুঁজে পাই। যেমন কবিতার মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষই বড়। তাদের কথাই থাকবে।"[১২] যদিও, "যমদূত দেয় চৌকি।/ সাবধান!/ বাঁয়ে যাস কে?/ ভাল যদি চাস ভোট দে/ ভুঁড়িদাসদের বাক্সে।।" ('রাস্তার গল্প')-এর মতো দুর্নীতিগ্রস্ত বুর্জোয়া ধনিকদের ভোট-আদায়ের রাজনীতির বিরোধী কবিতা, কিংবা "বাঁয়ে চলো ভাই,/ বাঁয়ে—/ পঙ্গপালকে তাড়িয়ে, মাঠের/ আমরাই হবো সম্রাট" ('বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে')-এর মতো শ্রেণিসংগ্রামের আহ্বানে মুখর কবিতা 'ফুল ফুটুক'-এরও অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পাশাপাশি মাঠ-ময়দানে ভুখমিছিলের নেতৃত্বদানে ব্যাপৃত কবি ক্রমশ 'ক্ষুধা'-'দারিদ্র্য'-'জনযুদ্ধ'-এর মতো বাঁধাবুলির ওপারে মানুষের জীবনের দিকেও ফিরে তাকিয়েছেন। তত্ত্ব আর মানুষের মধ্যে কে বড়— এ সংশয় থেকে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন জীবনের প্রতি এক আদ্যন্ত ভালোবাসায়—

আমার মানা
আর না-মানার মাঝখানে
একটা সংশয়
সেখানে তাকিয়ে দেখি
কী আশ্চর্য
আমার ভালোবাসার মুখ

('ভালোবাসার মুখ'/ এই ভাই)

তাই তিনি এখন বলতে পারেন, "ফুল ফুটুক না ফুটুক/ আজ বসন্ত" ('ফুল ফুটুক না ফুটুক'/ ফুল ফুটুক)। বাতাসে উড্ডীন তাঁর সোচ্চার কবিকণ্ঠ নেমে এসেছে মাটির কাছাকাছি, দলমতের চশমা খুলে মানুষের হৃদ্‌স্পন্দনের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। আর সেই আঙিনার মাটিমাখা একের পর এক গল্পে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে রঙিন, শ্বাস-প্রশ্বাসে স্ফুরিত। এই 'অল্প কথায় গল্প বলার ঝোঁক'- এর প্রসারণ লক্ষ করা যায় 'ফুল ফুটুক', 'যত দূরেই যাই', 'কাল মধুমাস' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে। গল্পগুলো কবি নিয়েছেন খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন থেকে— মূলত 'কলকাতা সহরতলী অঞ্চলে চটকলকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার মধ্যে' এ- গল্পগুলির উৎস নিহিত—কবিতায় উপস্থাপিত সে জীবন কবির জীবনদৃষ্টির আলোকে সাধারণত্বের স্তর পেরিয়ে হয়ে উঠেছে প্রেমে-ক্ষোভে-প্রতিবাদে-আশায় চিরন্তনত্বের জন্য উন্মুখ।

'ফুল ফুটুক'-পর্বের কবিতাগুলিতে উঠে আসা চরিত্র ও ঘটনাবলীর ভৌগোলিক পটভূমি মূলত বজবজের চটকল-সংলগ্ন শ্রমজীবী বসতি এবং ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রাম। এই ব্যঞ্জনহেড়িয়ার একটি জোলা পরিবারের গল্প নিয়েই সুভাষ লিখেছিলেন 'সালেমনের মা'। কবিতার আড়ালের গল্পটি নানা আকারে বিবৃত করেছেন লেখক 'যখন যেখানে', 'ডাকবাংলার ডায়রী', 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'-র বিভিন্ন লেখায়। 'কবিতার বোঝাপড়া' গ্রন্থের 'এক হাতুড়ের জবানবন্দী : 'সালেমনের মা'' লেখাটিতে গল্পটির সামান্য পৃথক একটি রূপ বিবৃত হয়— যেহেতু পূর্বোক্ত রচনাগুলিতে লেখকের নিজের ভাষ্যমতেই গল্পের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তিনি, তাই ১৩৯১-তে আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারধর্মী লেখাটিকেই এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হল। ১৩৪৯-এর মন্বন্তরে এই জোলা পরিবারের জামাই, দিনমজুর বাবর আলি মানসিক ভারসাম্য হারায়। তার স্ত্রী গোলসান শিশুকন্যা সালেমনকে নিয়ে পিত্রালয়ে ফিরে আসে—কিন্তু জোলা পরিবারেও তখন নিতান্তই খাদ্যাভাব। সালেমনের মা দ্বিতীয় একটি বিবাহ সেরে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় সালেমনকে ফেলে—সম্ভবত কলকাতায়। চটকলের মজুরদের বোনাসের দাবিতে 'পাঁচ ইস্টিশান পেরনো মিছিলে'-র সঙ্গে সালেমনও এসেছিল কলকাতায়—যেন তার মাকে খুঁজতেই। সেই বিবরণ কবির কলমে অক্ষয় রূপ লাভ করেছে—

এ কলকাতা শহরে
অলিগলির গোলকধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি,
সালেমনের মা?
বাবরালির চোখের মত এলোমেলো
এ আকাশের নিচে কোথায়
বেঁধেছো ঘর তুমি, কোথায়
সালেমনের মা?

('সালেমনের মা'/ ফুল ফুটুক)

এই কবিতাটি থেকেই কবি হিসেবে সুভাষের বিবর্তনের পথরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন। একসময় যে মিছিলের সঙ্গে অন্বিত হত কেবল শ্লোগানোপম উচ্চনাদ— "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ/ রুখব দস্যুদলকে আজ" ('জনযুদ্ধের গান'/ চিরকুট) কিংবা "রুখবে কে আজ চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার/ বন্ধ মুঠিতে বজ্র তৈরী, মিছিলে হাঁটি" ('স্ফুলিঙ্গ'/ ঐ) ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি—আজ সেখানে মিছিলের গলা মিলে যায় সালেমনের কান্নাভেজা আর্তস্বরে। মিছিলের পদভারে যেমন মাটি কাঁপত, তেমনি আকাশও হয়ে উঠত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, আক্রোশে অস্থির—"ঝড় আসন্ন, আকাশে মেঘের কুচকাওয়াজ"(ঐ), "কঠিন মাটিতে ক্রুদ্ধ পদশব্দ,/ আগে চলো আগে।/ অন্তরীক্ষে গুরু গুরু প্রতিধ্বনি জাগে" ('বর্ষশেষ'/ ঐ)। কিন্তু আজ আকাশের উপমা 'পাগল বাবরালির চোখ'—উদ্‌ভ্রান্ত, এলোমেলো। সমষ্টিধর্মের অত্যুজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা নয়, ব্যক্তিস্বভাবের পেলব রং আজ সুভাষের কবিতায় প্রকৃতির অলংকার হয়ে উঠেছে। মানবিক সহানুভূতিতে একদা 'পদাতিক' সেনানী কবি সুভাষের কাব্যের অন্তঃপুর কতখানি আর্দ্র হয়ে উঠেছে—তা অনুভব করা যায় চটকল-শ্রমিকের দাবি আদায়ের মিছিলের প্রস্তাবিত বীর্যবত্তার পরিবর্তে কবিতার অভিকর্ষগত কেন্দ্রটিকে মাতৃহীন সালেমনের আকুল আবেদনের দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখেই। কবিতার আকারে একটি পূর্ণ গল্প উপস্থাপন না করে গল্পের আভাসটি দিয়ে যান কবি— বক্তব্যের ভারে কবিতাটিকে আক্রান্ত না করে প্রয়োজনীয় নীরবতার অবকাশটি খুঁজে ভাবের বিস্তারের পরিসর তৈরি করে নেন তিনি, তাই 'সালেমনের মা' হয়ে উঠতে পারে মর্মস্পর্শী, কালজয়ী একটি সৃষ্টি।

বজবজের চটকল শ্রমিক-বসতি আর ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের পটভূমিকায় এভাবেই ছোট ছোট গল্পের আভাস দিয়ে যান কবি একের পর এক কবিতায়। কিছু ক্ষেত্রে কবিতায় উপস্থাপিত সে গল্প ছোটগল্পসুলভ পরিপূর্ণতায় উন্নীত হয় ('বাসি মুখে', 'একটি লড়াকু সংসার', 'ড্যাং ড্যাং ক'রে'), আবার কখনো গল্পকে ছাপিয়ে ওঠে কবির নিজস্ব জীবনভাবনা ('অগ্নিগর্ভ'), কখনো আবার একটি কেন্দ্রীয় প্রতীতির অভাবে গল্প হয়ে ওঠার পরিবর্তে বাস্তবমুখিন বিবরণে পরিণত হয় কোনো কবিতা ('এক অসহ্য রাত্রি')। সালেমনের মাতুলালয়ের অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র ফুটে ওঠে 'বাসি মুখে' কবিতায়। পেশায় জোলা এই পরিবারের বৃদ্ধ কর্তাপুরুষটি দিনরাত ঠকঠকি তাঁতে গামছা বুনত, কিন্তু তাতে বৃহৎ সংসারের দিনগুজরান হওয়া ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছিল— কারণ সুতোর কারবার হয়ে পড়েছিল চোরবাজারের অধীন। সুভাষের ভাষায়, "গাঁয়ে আর কারো বাড়িতে অত অভাব দেখিনি"[১৩]। পরিধানের শাড়ির শতচ্ছিন্নতার লজ্জায় ঘরের বাইরে বেরোতে পারত না এই পরিবারের মেয়েরা। যে পরিবারের পেশা কাপড় বোনা, তাদেরই পরনের কাপড় নেই— এ এক আশ্চর্য পরিহাস! হয়তো সেকারণেই, "এত রাত্তিরে জোলাদের ছোট বউটা/ পাড়ে ল্যাম্পো রেখে আছ্‌ড়ায়/ এক গাদা বিশ নম্বর সুতোর বাণ্ডিল।" ('বাসি মুখে'/ ফুল ফুটুক) অন্যদিকে, সুতীব্র অভাবের তাড়নায় "বাড়ির জোয়ানমদ্দ ছেলেটা বাধ্য হয়ে বেশ্যাবাড়িতে তাড়ি"[১৪] জোগানোর কাজে নেমে পড়ে। তার সেই গোপন ব্যবসার বিবরণ পাই কবিতায়—

নতুন বিয়ে করা ছেলেটার দেখা নেই—
সারাটা শীত শেষ রাত্তিরে উঠে
কল্‌সী কল্‌সী রস এনেছে,
সারাটা গ্রীষ্ম রাত গভীর হ'লে
গোপন আড্ডায় মাতালদের নেশাগ্রস্ত ক'রে
তবে সে ফিরবে।

('বাসি মুখে'/ ফুল ফুটুক)

উত্তরণের আশাহীন দুর্বিষহ অর্থনৈতিক অবস্থার নীরন্ধ্র অন্ধকারে সুতোর বাণ্ডিল আছড়ানোর শব্দ যেন প্রতিধ্বনি তোলে অন্তহীন হতাশার— "অন্ধকারকে আছ্ড়াতে আছ্ড়াতে/ ছোট্ট বউটা ভাবে—/ তাহলে কালও উনুনে আঁচ পড়বে না" (ঐ)। কবিতায় বর্ণিত গল্পের হয়তো এখানেই ইতি হয়—কিন্তু গল্পকে ছাপিয়ে ওঠে কবিতা, কারণ প্রত্যক্ষ বর্ণিতব্যের আড়ালে কাব্যশরীরে কবি লুকিয়ে রাখতে পারেন গভীরতর ব্যঞ্জনার ফল্গুধারা। যেমন, পূর্বোদ্ধৃত কাব্যাংশে প্রযুক্ত 'মাতালদের নেশাগ্রস্ত করা' পদগুচ্ছ পুনরুক্তবদাভাসের উদাহরণ, যেখানে আপাতভাবে দুটি সমার্থক শব্দ পাশাপাশি বসেছে— কিন্তু প্রকৃত অর্থে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন তাৎপর্যে। 'মাতাল' আভিধানিকভাবে 'মদ্যপানহেতু উন্মত্ত', কিন্তু লোকব্যবহারে কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে 'মাতালের মত আচরণ' হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। যে মানুষগুলি সুদীর্ঘকাল মালিকপক্ষের অত্যাচার সহ্য করে এসেছে মুখ বুজে, আর ভেতরের যাবতীয় ক্ষোভ-দ্বেষ ডুবিয়ে ফেলছে মদ আর মেয়েমানুষের নেশায়—প্রতিবাদহীন, চেতনাহীন সেই মানুষগুলোই সুভাষের চোখে 'মাতাল' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যাদের নেশাগ্রস্ত করে আরেকটি বুভুক্ষু পরিবার নিজের রুজিরুটির সংস্থান করছে। 'অগ্নিগর্ভ' কবিতায় কবি যখন বলেন—

> গোটা দিন নয়,
> দিনের আধখানা এখানে জীবন।
>
> সন্ধ্যে হলে অন্ধকারে মোড়া অন্তহীন পাথারে
> ডুব দাও।
> চোখ বন্ধ করো, বন্ধ করো—
> পেটের আগুনে মুখ দেখো না রাত্রির।

('অগ্নিগর্ভ'/ ঐ)

তখন বোঝা যায়, এ ওই নেশাগ্রস্ত মনেরই প্রলাপ— সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা মানুষের জিজীবিষাকে, নিষ্ক্রিয়তার ভারী চাদরে ঢেকে রাখতে চাওয়া ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হতে থাকার বোধজাত বেদনা ও বিক্ষোভকে। বস্তুত, এ এক আত্মখাদক চক্র—যেখানে বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী মানুষকে নিজেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করে চলে, যাতে তারা নিজের শ্রেণিপরিস্থিতি অনুধাবন করতে না পারে, শ্রেণিসংগ্রামে নেমে নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে কখনোই উদ্যোগী না হয়। ইউরো-কমিউনিজমের অন্যতম প্রধান চিন্তক আন্তোনিও গ্রামসির মতে, রাষ্ট্র (যা আসলে শ্রেণি-আধিপত্যের হাতিয়ার) তার শাসন বজায় রাখে দুটি সমান্তরাল পদ্ধতি অনুসরণ করে— "একদিকে বলপ্রয়োগ বা দমনমূলক কার্যকলাপ, আরেকদিকে নিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা-আচরণ প্রসারিত করে জনগণের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য অর্জন করা।"[১৫] প্রথমটিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'ডোমিনিয়ন' বা প্রভুত্ব হিসেবে, দ্বিতীয়টিকে 'হেজিমনি' বা আধিপত্য নামে। শাসকশ্রেণির সাংস্কৃতিক আদর্শগত প্রভাব বা আধিপত্যকে স্বীকার করে নিয়েই শাসিত ও শোষিতশ্রেণির মানুষ নিজস্ব শ্রেণিস্বার্থ বিস্মৃত হয়, ফলে ক্ষুধা আর ধুঁকে-ধুঁকে মরার অশুভ চক্র শেষ হয় না। বিষয়টির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এরকম—

> প্রতিটি শ্রেণীই শুধু সরকারি সংস্থাদিতে নয়, ব্যাপক সমাজের স্বীকৃত অভিমত, মূল্যবোধ এবং মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নিতে চায়। যখন যে শ্রেণীসমূহ বিশেষ অধিকারভোগী, তখন সেই শ্রেণীগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রেও আধিপত্যের আসনটি দখন করে রাখে; এবং

> বুদ্ধিবৃত্তিগত আধিপত্য রাজনৈতিক আধিপত্যের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। ... সাংস্কৃতিক আধিপত্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের মৌলিক এবং পূর্ব শর্ত।[১৬]

(কে. কোলাকভস্কি, 'মেইন কারেন্টস অব মার্কসিজম', অনুবাদ- অজিত রায়)

'অগ্নিগর্ভ' কবিতার উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে এই হেজিমনিরই বয়ান শুনতে পাওয়া যায়। শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব স্বার্থকে সম্পূর্ণত প্রতিস্থাপিত করা শাসকশ্রেণির এই আধিপত্যের থাবা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিবাদ নয়, আত্মহননের পথ বেছে নিতে চায় শ্রমজীবী— কিন্তু এই পলায়নপরতা কোনো কার্যকরী সমাধানসূত্র জোগায় না। শ্রেণিচেতনার প্রথম স্ফূলিঙ্গ বোধহয় জাগে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের বাইরে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই। হয়তো তাই, "যে লোকটা একটু আগে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল/ এতক্ষণে সে বউয়ের গলা জড়িয়ে শুয়েছে।" ('অগ্নিগর্ভ'/ ফুল ফুটুক)। মৃত্যু নয়, জীবনের দিকে যাত্রাই প্রতিরোধের প্রথম সোপান হয়ে উঠতে পারে। হয়তো সেকারণেই সর্বাত্মক হতাশা সত্ত্বেও পরবর্তী প্রভাতের জন্য সামান্য 'অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগ' খুঁজে পাওয়া যায় 'বাসি মুখে'-এর অন্তিম পঙ্‌ক্তিগুলিতে— "অন্ধকারকে আছ্‌ড়াতে আছ্‌ড়াতে/ ছোট্ট বউটা ভাবে—/ তাহলে কালও উনুনে আঁচ পড়বে না" ('বাসি মুখে'/ ঐ)। উচ্চবর্গের বঞ্চনা আর অনাচারকে অপরিহার্য দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেওয়ার যে আপাত ইঙ্গিত ফুটে ওঠে এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে, তার মধ্যে বিদ্রোহের চাপা গর্জন কি শোনা যায় না অন্ধকারকে ক্রমাগত 'আছ্‌ড়ানো'-র অতিশয়োক্তিময় বর্ণনায়? বেঁচে থাকার সেই ইচ্ছেরই ছবি আঁকতে দেখা যায় কবিকে 'আর একটা দিন' কবিতায়—

> জলায় এবার ভালো ধান হবে—
>
> বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে
> এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে
> সারাটা উঠোন জুড়ে
> অন্ধকার নাচাতে নাচাতে।।

('আর একটা দিন'/ ঐ)

কবি জানেন, আলো আসার রন্ধ্রপথে "এক চোয়াড়ে অন্ধকার কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে/ সামনে কী আছে/ কিছু ঠাহর করা যায় না" ('সন্ধ্যামণি'/ ঐ)। অসীম নিরাশা আর ক্লান্তির পাঁকের মধ্যে যেন পুঁতে যেতে থাকে জীবনের পথে প্রতিটা পদক্ষেপ, কোনোক্রমে "ধ'রে ধ'রে পার হয়ে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোটা" ('আর একটা দিন'/ ঐ) প্রতিটা দিন চলে যায় আগের দিনের মতোই। তবু অন্যায় আর বঞ্চনার নিবিড় কালো বৃষ্টির কালিমায় পথ হারালে চলবে না—খুঁজে নিতে হবে সেই বৃষ্টির মধ্যে নিহিত নবজন্মের ইঙ্গিতটিকে, জীইয়ে রাখতে হবে নতুন দিনের অনন্ত আশা— "উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তোলার/ এই তো সময়।।" ('সন্ধ্যামণি'/ ঐ)।

বজবজের চটকল অঞ্চলের শ্রমিকজীবন-আশ্রিত 'একটি লড়াকু সংসার' কবিতাতেও দেখা যায় অমোচনীয় দারিদ্র্য আর বুভুক্ষার চিত্র— "নেভানো উনুনের ওপর পড়ন্ত আলোয়/ যেন/ ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে/ কাল বিকেলে মাজা ভাতের হাঁড়ি।" ('একটি লড়াকু সংসার'/ ঐ)। জ্বালানির অভাবে উনুন নিভন্ত, ভাতের অভাবে গতদিনের দুপুরের পর থেকে হাঁড়ি চড়েনি, খাওয়াও জোটেনি— দড়িতে ঝোলানো ভাতের হাঁড়ির সঙ্গে ফাঁসিতে ঝোলানো মানুষের তুলনা এই সমগ্র মৃত্যুমলিন দম-আটকানো পটভূমিটিকে পরিস্ফুট

করে তুলেছে। অর্থাভাব-জনিত বুভুক্ষার পাশাপাশি সমসময়ে খাদ্যাভাবের আরেকটি কারণ ছিল রেশনিং ব্যবস্থার ক্রমাবনমন। ১৯৫২-তে সুভাষ বজবজে আসেন, আর ১৯৫২ থেকেই সরকারি গণবণ্টন প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার কারণে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়—"ভারত সরকারের খাদ্যনীতির সুযোগ নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরোক্ষ মদতে খাদ্যে ফাটকাবাজি করে মজুতদার মুনাফাবাজদের রমরমা অবস্থা।"[১৭] এই পরিস্থিতির ইঙ্গিত মেলে কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

জেলা আপিস রিক্তহস্ত,
কলকাতা থেকে খালি হাতে ফিরে
দাওয়ার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
রেশনের ভাঁজ করা থলি।
এ-মাসের শেষাশেষি,
ও-মাসের শেষ কিস্তিও মেলে নি।

('একটি লড়াকু সংসার'/ ফুল ফুটুক)

চটকল অঞ্চলে সম্ভাব্য মৃত্যুর যে খতিয়ান পেশ করেন সুভাষ—"শরীরে পুষ্টি না পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মৃত্যু। তেরো টাকা হপ্তায় দু-আনা সুদ গুণে গুণে মৃত্যু। কোথাও কাজ না পেয়ে দুটো হাত মাটিতে ঠেকিয়ে ঘরে বসে তিলে তিলে মৃত্যু।"[১৮], তাতেও দেখা যায় সমবেত প্রচেষ্টায় অত্যাচারের ঊর্ণাজাল থেকে মুক্তির প্রয়াসের পরিবর্তে নির্বিকার নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারে দমবন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগেরই করুণ চিত্র। কিন্তু কবির চোখে এ অন্ধকারও ক্রমশ 'ধৈর্যচ্যুত' হয়ে উঠতে থাকে— "বালব চুরি-করা রাস্তায়/ জোনাকিদের চোখে/ চম্‌কে চম্‌কে ওঠে কী এক ষড়যন্ত্র।" ('বাসি মুখে'/ ঐ)। বুর্জোয়াশ্রেণি আর তাদের তাঁবেদার দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ-প্রশাসনের অত্যাচারের তীব্রতায় ধীরে ধীরে প্রলেতারিয়েতের আত্মঘাতী নেশার ঘোর কেটে যেতে থাকে, হৃদয়ের পাতালজলে ঘাই মারতে থাকে প্রতিকারস্পৃহার প্রকাণ্ড রুই, বিড়ির আগুনের মৌতাতে আর জ্বলে না 'রক্তহীন কাজলটানা ক্ষুধার্ত চোখ'— কারণ—

চটের অদৃশ্য ফেঁসোগুলো
বুকের গহ্বরে দড়ি পাকিয়ে
বুঝি হৃৎপিণ্ডগুলোকে বিষম জোরে টানছে।।

('এক অসহ্য রাত্রি'/ ঐ)

আসলে এই অন্ধকার যতখানি পরিস্থিতিজাত, প্রায় ততোখানিই শ্রমিক শ্রেণির মানসিক অবক্ষয়ের পরিণাম— শ্রেণিচেতনার উদ্ভাসে সেই অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলতে পারলেই নিপীড়নের অনন্ত সমুদ্রের কূল দেখা যাবে। অকর্মণ্যতার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকার পরিবর্তে এই নিপীড়িত মানুষগুলি যখন নিজেকেই বলতে পারবে—"— না, এই অন্ধকার থাকার নয়।/ ... —না, এই মাথা নিচু করে মরা নয়।" ('অগ্নিগর্ভ'/ ঐ), তখনই উত্তরণের দিগ্‌দিশা মিলবে। আন্তোনিও গ্রামসির ভাষ্য অনুযায়ী, "সমাজবিপ্লবের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে, সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে শাসকশ্রেণীর স্বার্থকে সর্বজনীন স্বার্থ হিসেবে দেখার ভ্রান্তি দূর করা, অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য বর্জন করা।"[১৯] সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই গল্পমুখ্য কবিতাগুলিতেও যেন গ্রামশির তত্ত্বেরই অনুরণন শোনা যায়, যেমন, 'একটি লড়াকু সংসার'-এ পাওয়া যায় শ্রমজীবী মানুষগুলির ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত— "হপ্তাবাজারে বিরাট সভা কাল— শান্তির।/ ঢোল বাজছে ছ-নম্বর গেটে।" 'বাবরালির চোখের মত' রচনায় শোনা যায় 'একটা গোটা তল্লাট'-এর ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়ানোর সেই বর্ণনা—

> চটকলের গেট থেকে বেরিয়েই যে-লোকগুলোকে এতদিন হাঁফ-ধরা গলায় বলতে শুনেছি— শালারা আর বাঁচতে দেবে না— তারাই আজকাল গলায় ঝাঁঝ দিয়ে বলছে—দাও শালাদের ঠাণ্ডা করে।
>
> হপ্তাবাজারে মিটিং হয় টিফিনের সময়। লালঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে লোকে হাঁ করে শোনে তাদের সেই নেতার বক্তৃতা, ক'বছর আগে ছাঁটাই হয়ে জেলে যাবার আগে পর্যন্ত যে তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে বজবজ মিলে তাঁত চালিয়েছে আর এখন যে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে মন্ত্রীদের মুখের ওপর ধুড়ধুড়ি ধুইয়ে দিতে একটু ভয় পায় না।[২০]

'ছেঁড়া কামিজ মাথায় গলিয়ে' যে লোকটা ছ-নম্বর মিলগেটে হাজির হয় 'একটি লড়াকু সংসার'-এ, সেও হয়তো এরকমই কোনো অকুতোভয় ছাঁটাই শ্রমিক— যার রাজনৈতিক বিশ্বাসের খাতিরে একটি গোটা পরিবার অকল্পনীয় দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়। বস্তুত, "কবিতার লড়াকু সংসার আসলে বজবজের সে সময়ের একজন লড়াকু কমরেডের সংসারের গল্প। নেতৃত্বস্থানীয় সেই পার্টি কমরেডের নাম শ্রীরামাচরণ সাইনী। তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী তখন, কাজ করেন চটকল মজুরদের মধ্যে। অত্যন্ত অভাবের সংসার ছিল তাঁর। পার্টিরও তখন চরম দুরবস্থা। সামান্য মাসোহারাটুকুও তখন দিতে পারছে না তার সর্বক্ষণের কর্মীদের। এই চরম অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কমরেড সাইনির বাড়ির ভেতরে লড়াই ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে।"[২১]। দেখা যায়, মেজো নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধা ঠাকুমা রেললাইন থেকে কয়লা কুড়িয়ে সামান্য উপার্জনের চেষ্টা করেন। কবি জানেন, এর ফলাফল হিসেবে "আজকের নতুন ফোস্কাগুলো আজকে সারাটা রাত/ তাদের হাতে জ্বলবে" ('একটি লড়াকু সংসার'/ ফুল ফুটুক)— তবু তারা পিছিয়ে যাবে না, ভেঙে পড়বে না। পরিবারের আসন্নসম্ভবা বধূটিও আশ্চর্য মানসিক স্থৈর্যের পরিচয় দেয়— এমনকী "পেটে তার উপোসী ছেলেটা কিচ্ছু বলে না/—শুধু দিন গোণে।।" (ঐ) দিনগোনার এই আপাত নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ক্লীবত্ব নেই, রয়েছে প্রবল মানসিক জোরের পরিচয়, যা কেবলমাত্র জীবনের প্রতি আস্থাবান মানুষের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব। রাজনৈতিক বিশ্বাস আর বেঁচে থাকার অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলির মধ্যে প্রার্থনীয় সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেছেন যেন এ-কবিতায় লেখক, যা আসলে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের জগৎটিকেই পরিস্ফুট করে তুলেছে। যে কবি একসময় ভেবেছিলেন—"বুঝলে মুখুজ্যে, জীবনে কিছুই কিছু নয়/ যদি কৃতকার্য না হলে।" ('মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ: ১'/ যত দূরেই যাই), তিনি ক্রমশ প্রচেষ্টার মূল্য বুঝেছেন, অনুধাবন করেছেন জীবনকে তার সহজতায় ও সম্পূর্ণতায়। অনুভব করেছেন, কেবল লড়াইয়ের জন্যে লড়াই নয়, মানুষের জন্যে লড়াই। মানুষকে ভালোবেসে তবেই সে লড়াইয়ের পূর্ণতার সাধনা, তাই—

> যার লাগে না কো মিষ্টি
> মানুষের এই সৃষ্টি,
> যে বলবে এই পৃথিবীতে আছে
> এক রং
> শুধু রক্তের—
> যত থাক নামডাক তার
> যত বড় দল থাকুক অন্ধভক্তের—
> টেঁকে কি না টেঁকে
> একবার ভালো কবিরাজ ডেকে

অচিরে দেখানো দরকার।
ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোয়।
আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক

—একটুও যার ভাঙা নয়।

('শুধু ভাঙা নয়'/ ফুল ফুটুক)

স্পষ্টত, "রাজনৈতিক দলমতের কষ্টিপাথরে বিশ্বসংসারকে বিচারের প্রবণতা অতিক্রম করে তিনি নিটোল পরিপূর্ণ মানবতাবাদে আত্মস্থ হয়েছেন"[২২] সফলতা আর ব্যর্থতার জল-অচল সাদা-কালো দ্বিমেরুবিষমতার মাঝের ধূসর যাপনটিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবিষ্কার করেছেন— যার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে ভালো দিনের জন্যে অনন্ত অপেক্ষা, আর সেই সূর্যকরোজ্জ্বল, ভাতের গন্ধে ভরপুর দিনগুলোতে পৌঁছনোর জন্যে মুখ-বোজা দাঁত-চাপা লড়াই। আর সেই উত্তরণের প্রয়াস কেবল ভাঙনের জয়গান গাওয়ায় নেই—আছে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছার মধ্যে। উনুনে আঁচ না পড়ার দুশ্চিন্তার মধ্যেও পরের দিনটার প্রভাতের আলো দেখার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, ক্ষুধার যন্ত্রণার মধ্যেও সম্মিলিত যাপনের প্রয়াসের মধ্যে, নতুন একটি প্রাণকে পৃথিবীর আলোর দেখানোর প্রচেষ্টার মধ্যে, অনন্ত অন্ধকারের মধ্যেও আলোর ইশারা খুঁজে নেওয়ার ইচ্ছার মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই জিজীবিষা। এই প্রবল জিজীবিষারই সাক্ষ্য মেলে 'ড্যাং ড্যাং ক'রে' কবিতায়।

স্বামী-পরিত্যক্তা একটি মেয়ের গর্ভবতী হয়ে পড়ার গল্প 'ড্যাং ড্যাং ক'রে'-এর মূল উপজীব্য। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে শোনা যায় সমাজমানসের তির্যক দৃষ্টিনিক্ষেপের গল্প— একটি কোলের শিশুকে নিয়ে স্বজনহারা নিরুপায় মেয়েটির প্রতি সহানুভূতির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না কোথাও, কিন্তু তার পদস্খলনে দুয়ো দিতে এগিয়ে আসে সকলেই। কবিতার তৃতীয় স্বরটিকে— তার নাটকীয় স্বরটিকে এখানে অসাধারণ মুন্‌শিয়ানায় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন কবি সুভাষ—

ট্যাঁকে বাচ্চা নিয়ে
এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাসন মাজে
রাত্তিরে গাছতলায় মাদুর বিছিয়ে শোয়
যে মেয়েকে স্বামী নেয় না
যমেরও অরুচি—

ছি ছি!
আবার তার ছেলে হবে!

('ড্যাং ড্যাং ক'রে'/ ফুল ফুটুক)

গ্রামগঞ্জে ভ্রমণের সুবাদে সুভাষ বারেবারে এমন সহায়-সম্বলহীনা নারীদের সংস্পর্শে এসেছেন—খুঁজে নিতে চেয়েছেন তাদের এই দিশাহীন সর্বনাশের মুখোমুখি এসে দাঁড়ানোর কারণগুলি। 'সোনালী সূতোর পাকে পাকে' রচনায় সুভাষের জবানিতে জানা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর এই পত্নীবিসর্জনের মূলে "যতটা না

হৃদয়হীনতা, তার চেয়েও বেশী থাকে পরিবার প্রতিপালনের অক্ষমতা।"[২৩] কিছু ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে যায় 'বিয়ের দেনমোহরের টাকা' ফাঁকি দেওয়ার মতলবে। কিন্তু কারণ যাই থাকুক না কেন, স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়েগুলির পরিণতি প্রায় একই হয় :

> স্বামীরা যাদের ছেড়ে পালায়, সেই মেয়েদের কী অবস্থা হয়? বাপ-ভাইয়ের
> সংসারে বোঝা হতে কে-ই বা চায়? আর কে-ই বা দেয়?
> তখন সামনে দেহ বিক্রীর রাস্তাটাই শুধু খোলা থাকে।[২৪]

প্রত্যক্ষ দেহপসারিণীকে নিয়েও সুভাষ কবিতা লিখেছেন 'আলো থেকে অন্ধকারে'— সে কবিতায় দেহ বিক্রেতা রমণী যেন সমগ্র সমাজ-সভ্যতা, তাদের 'ভাব দ্বন্দ্ব ভাল মন্দ ইত্যাকার' উপরিতলিক ভাবনার বিলাসকে হিংস্র নখে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে; "খালি পেটে/ নখে দাঁতে জিভে দিয়ে ধার"। "সারা অঙ্গে পাউডারের খড়ি মেখে/ ভয় ভালবাসা লজ্জা/ সমস্ত ঘুচিয়ে/ দুই বুকে তীক্ষ্ণ দুটি বল্লম উঁচিয়ে" ('আলো থেকে অন্ধকারে'/ যত দূরেই যাই) সে নিজেকে যেন এক জীবন্ত অস্ত্রের মতো তুলে ধরে তাদের সামনে, যারা তার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে একটি সুস্থ জীবনের অধিকার। 'ড্যাং ড্যাং ক'রে'-তেও দেহব্যবসার একটি আপাত ইঙ্গিত থাকলেও সেখানে নেই এই প্রতিশোধস্পৃহা। মৃত্যুমুখিনতা নয়, সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে জীবনমুখিনতা, কারণ সুভাষের কাছে—"মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না—/ জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে ঢ্যাঙা নয়" ('শুধু ভাঙা নয়'/ ফুল ফুটুক)। সামাজিক বিধানমতে 'ড্যাং ড্যাং ক'রে' কবিতার বধূটি 'ব্যভিচারিণী', কারণ তার বিবাহ-বহির্ভূত যৌন-সংসর্গের বিষয়টি কবিতায় প্রকাশিত সামাজিক কণ্ঠস্বরের তির্যকতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু কবি এখন সমাজকে নয়, ব্যক্তিকে তাঁর কবিতার কেন্দ্র করে তুলেছেন। তাই সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লঙ্ঘন-জাত লজ্জার ওপারে ব্যক্তির নিরন্তর জীবনসংগ্রামই তাঁর কবিতায় উজ্জ্বলতর বর্ণে অঙ্কিত হয়—

> জলের কলে
> সেই লজ্জাকে ঢাকতে
> হাঁটি-হাঁটি পায়ে পায়ে
> মার হাতে ছেঁড়া শাড়িটা এগিয়ে দেয়
> লজ্জাকে মাথার মণি করা ছোট্ট একটি জীবন—
> ক'দিন আগেও
> শানের ওপর যে হামা দিত!
>
> ('ড্যাং ড্যাং ক'রে'/ ঐ)

একটি শিশুর ভরণপোষণের দায়ভার বহনে ব্যতিব্যস্ত একটি সহায়হীন নারী কীভাবে আরেকটি শিশুর জন্মদানে পুলকিত হবে, কিংবা শিশুজন্মদানের প্রয়োজনীয় পরিবেশই বা সে কীভাবে পাবে— এরকম নগ্ন বাস্তবের প্রতিধ্বনি এ-কবিতায় পাওয়া যায়নি। পিতৃপরিচয়ের প্রয়োজনহীন একক মাতৃত্বের যে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা একবিংশ শতাব্দীর এই তৃতীয় দশকে এসে অন্তত খাতায়-কলমে তৈরি হয়েছে, তার কোনো দূরবর্তী চিহ্নও এ-কবিতার রচনাকালে থাকা সম্ভব ছিল না। বেশ্যাসন্তানের নিজস্ব জীবনসংগ্রাম নিয়ে অরুণেশ ঘোষ যেভাবে ভেবেছেন, সেই ভাবনার প্রতিফলন সুভাষের কবিতায় নেই— বরং আছে এক দুর্মর আশাবাদ। পারিপার্শ্বিক সংসারের ঘৃণার তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আগে পর্যন্ত যে শিশুর এক এবং একমাত্র জগৎকেন্দ্র তার মা—সদ্য হাঁটতে শেখা সেই শিশুর পক্ষে মায়ের বা নিজের 'সামাজিক লজ্জা'-র ধারণা করা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। হয়তো সে পীড়নে অভ্যস্ত, কিন্তু জন্মগতভাবে বিনা দোষে যে

আত্মিক বিপন্নতায় তাকে ভুগতে হবে হয়তো আজীবন—তার সম্পর্কে কবি এখানে নীরব। অনুধাবন করা যায়, সামাজিক বিধিবিধানের বাড়বাড়ন্তকে কবি সুভাষ মৃত্যুরই আরেকটি রূপ হিসেবে উপলব্ধি করেছেন, আর তার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন মৃত্যু-অতিশায়ী সুতীব্র এক জিজীবিষাকে। জন্মপরিচয় মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তার নিজের কর্মের মধ্যে দিয়েই লিখিত হবে তার নিজস্ব ইতিহাস—এ বিশ্বাস থেকেই কবি বলতে পারেন—

তার মানে—

তাহলে
পৃথিবীতে
আরও দুটো চোখ
আরও একটা মাথা উঁচু ক'রে
দুপাশে পাখির ডানার মত দুটো হাত
দোলাতে দোলাতে
মাটিতে ড্যাং ড্যাং ক'রে হেঁটে যাবে। (ঐ)

আসলে কবি তো যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের প্রতিচ্ছবিকার নন। ফোটোগ্রাফিক যথার্থতায় বাস্তবকে প্রকাশ করার কোনো দায় নেই তাঁর— বরং রয়েছে নিষ্করুণ বাস্তবের উর্ধ্বায়নের স্বপ্ন দেখানোর দায়িত্ব। ছোটগল্প-রচয়িতার সে দায়িত্ব পালন কঠিন, কারণ সাধারণভাবে গল্পে থাকে যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তবপ্রতিমা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা—নইলে তার প্রাসঙ্গিকতা হারানোর ভয় থাকে। গল্পে তথা কথাসাহিত্যে সেই বাঁধন ছেঁড়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছে জাদুবাস্তবতা—কিন্তু কবিতায় কবি অনায়াসে পারেন স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝের আপাত জল-অচল সীমারেখাটিকে ঘুচিয়ে দিতে। সমাজ-বহিষ্কৃত একজন নারীর সন্তান-সম্ভাবনা তাই কবিতায় অসীম সম্ভাবনার আকর হয়ে উঠতে পারে— যেভাবে কুমারী মাতার জারজ পুত্র, নাজারেথের যিশু হয়ে উঠতে পারে অনন্ত মেষপালের মতো পথভ্রষ্ট মানবসমাজের কাছে নতুন আলোর দিশারী। লজ্জা আর ঘৃণার ভস্মস্তূপের মধ্যে থেকে নবজাতকের উত্থানের যে ছবি উপরে উল্লিখিত কবিতাংশে এঁকে যান কবি, তা যেন ফিনিক্সের নবজন্মের দ্যোতক হয়ে ওঠে। কবিতা আর গল্পের নিজস্ব স্বভাবের সুষ্ঠু সংমিশ্রণে কবি প্রকৃত বাস্তবকে সম্ভাব্য বাস্তবের দিকে ঠেলে দিয়ে, 'যা আছে আর যা নেই'-কে মিলিয়ে 'জীবনের সবটুকু'-কে ছুঁয়ে যান যেন।

"চিরজীবিত নবজাতক মৃত্যুপরম্পরাকে অতিক্রম করে জন্মপরম্পরায় বারবার দেখা দেয়। কাব্যে, শিল্পে, মীথে এই নবজন্মের প্রতীক শিশু, উর্বরা ধরিত্রী বা জননী।"[২৫] বস্তুত, 'ফুল ফুটুক' পর্বে সুভাষের কবিতায় বারেবারেই জায়গা করে নিয়েছে সন্তানসম্ভবা নারী অথবা নবজাতকের চিত্ররূপ—আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা হতাশ্বাস, আপাত-নিষ্ফলা বর্তমানের বন্ধ্যাত্বকে প্রবল প্রাণশক্তির জোয়ারে প্লাবিত করে নিয়ে এসেছে ভবিষ্যতের আলোকিত ইশারা। 'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের 'মেজাজ' কবিতাতেও সামাজিক বিধিনিষেধের আড়ালে পারিবারিক মারমুখী শাসনতন্ত্র বজায় রাখার যে নিশ্ছিদ্র লোহার দেওয়াল গেঁথে তোলা হয়, তার মধ্যে ফাটল ধরায় এক নবজাতকের আগমনসম্ভাবনা। 'এক কালো অলক্ষুনে পায়ে খুরঅলা ধিঙ্গী মেয়ে'-র বিবাহিত জীবনে যত রকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা জুটতে পারে, তার সব কটিরই পরোক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় মেষচর্মাবৃত নেকড়ের মতো অনুক্ষণ মালা-জপমান, বাহ্য-বৈষ্ণব অন্তরে হিংস্র এক শ্মশ্রুমাতার বয়ানে।

নাকে অস্ফুট শব্দ ক'রে

থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল হঠাৎ
মালাটার গলা টিপে ধরল।
মিন্‌সের আক্কেলও বলিহারি!
কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুনে
পায়ে খুরঅলা ধিঙ্গী মেয়ে ধরে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।
কেন? বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিল না?
বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—
হ্যাঁ, দিয়েছিল!
গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল না?

('মেজাজ'/ যত দূরেই যাই)

গল্পের উপাদান বুনে তোলার জন্য গদ্যছন্দ এবং কথ্যভাষার ব্যবহারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ মুনশিয়ানা লক্ষ করা যায় এখানে। একইসঙ্গে 'গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায়', 'নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়' কিংবা 'বড় তেল হয়েছে'-র মতো শব্দবন্ধের ব্যবহার যেমন গল্পের আটপৌরে প্রেক্ষাপটটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে, তেমনি আবার "মোটা চশমায় কাঁথা সেলাই করতে করতে/ শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলেন"-এর মতো অতিশয়োক্তির ব্যবহার কাব্যময়তার অনায়াস সঞ্চার ঘটিয়েছে। চারিত্রিক স্বরভঙ্গী বা 'টোন'-এর যথাযথ ব্যবহার নাটকীয়তার সৃজনেও সক্ষম হয়েছে সহজেই— যে নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি তৈরি হয় একটি 'কালো মেয়ে'-র নিজের কৃষ্ণাঙ্গত্ব-জাত সামাজিক অপমানকেই নিজের সগর্ব পরিচয় করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে। কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটির বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য তার পিতাকে অতিরিক্ত পণ জুগিয়ে সামাজিক রফা করতে হয়, শ্বশুর বাড়িতে মেয়েটিকে থাকতে হয় সর্বদা অন্যদের পায়ের নিচে—যেহেতু তারা ওর অবাঞ্ছিত 'কালো' অস্তিত্বটিকে সহ্য করছে। লাঞ্ছনার চরমত্বে পৌঁছে মেয়েটি বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টাও করে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হয় এরকম—

ভাশুরপো ডাক্তার না হলে
ও-বউ এ-বংশের গালে ঠিক চুনকালি মাখাত।
কেন? অসুখ করে মরলে কী হয়?
ঢঙী আর বলেছে কাকে। (ঐ)

স্পষ্টত, মেয়েটির মৃত্যুকামনা করা হয়— কিন্তু তাও হতে হবে সমাজ-সম্মত উপায়ে, যাতে পারিবারিক সম্মান অটুট থাকে। দেখা যায়, বাড়ির মেজো ছেলেটি বাড়ির রোয়াকে বসে রাস্তায় মেয়ে দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু তার সেই লাম্পট্যও পারিবারিক আদর্শকে লঙ্ঘন করে না— সে দেখে "ফরসা ফরসা মেয়ে/ বউদির মতো ভূশুণ্ডি কালো নয়।" (ঐ)। কিন্তু সেই কালো মেয়েই যখন সমস্ত অপমানের কালি গায়ে জড়িয়ে 'মা-কালীর মত রণরঙ্গিণী বেশে' ঘুরে দাঁড়ায়, তখন সামাজিক শাসনের উদ্যত হাত ভয়ে নেমে আসে। বোঝা যায়, জীবনের সঙ্গে তত্ত্বের সঠিক সমাবেশের ফলে সুভাষ নিপীড়নবিরোধী সংগ্রামকে কেবল সুনির্দিষ্ট একটি অর্থনৈতিক শ্রেণির একচেটিয়া কর্তব্য হিসেবে না দেখে তাকে বহুবিচিত্র সামাজিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে মনে করছেন। 'ড্যাং ড্যাং ক'রে'-তে যেমন সামাজিক ঘৃণার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো পক্ষীশাবকের রূপকল্প ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি 'মেজাজ'-এ "মাথা উঁচু ক'রে/ গটগট গটগট ক'রে" চলা, অবিনয়ী কণ্ঠস্বর ("গলার স্বরটা ঠিক কাছা-গলায়-দেওয়ার মত নয়") কিংবা "কোমরে আঁচল জড়িয়ে/ চোখে চোখ

রেখে শাশুড়ির সামনে" দাঁড়ানোর মতো ক্রিয়াবিশেষণের ব্যবহারে শোষকের (এক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান তথা ক্ষমতাশালী সদস্যদের) নিয়ত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক নিপীড়িতের রুখে দাঁড়ানো এবং নিজ অধিকার ও শ্রেণিস্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতার স্বাক্ষর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বউয়ের নবলব্ধ এই আত্মমর্যাদাবোধের কারণ হিসেবে সন্তান-সম্ভাবনার বিষয়টিকে তুলে ধরায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, সন্তানবতী রমণীর পারিবারিক মর্যাদাবৃদ্ধির পুরুষতান্ত্রিক তথা আধিপত্যবাদী কাহিনিসূত্রটিকেই কবি ব্যবহার করলেন— কিন্তু, কবিতার বয়ান অন্য কথা বলে।

বউ বলছে: 'একটা সুখবর আছে।'
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা ; মা কান খাড়া করলেন।
বলছে : 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস ক'রে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে,
'কী নাম দেবো, জানো?
আফ্রিকা।
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।।' (ঐ)

বস্তুত, প্রসূতি বধূটি প্রথাগত ধরনে সন্তানধারণের গর্বে 'দেমাক' দেখায়নি— তার আচার-ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে প্রতিকূল পরিবেশে নিজের তথা নিজের সন্তানের সুরক্ষার প্রয়োজনে। এতদিনের মুখ-বুজে সহ্য করে চলা উচ্চবর্গীয় আধিপত্যের শিকল ছিন্ন করেছে সে নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়েই— মাতৃত্বই এখানে মৌল প্রভাবক হয়ে ওঠে। নিজের অস্তিত্বের প্রতি বধূটির নবজাগ্রত মর্যাদাবোধই প্রকাশ পায় তার 'দেখো ঠিক আমার মত কালো হবে' উচ্চারণে— যা শুনে শাশুড়ির প্রতিক্রিয়া উচ্চবর্গীয় আধিপত্যের আহত অহংকারের বিফল গর্জনকেই প্রকাশ করেছে। নিজের আত্মজের আস্তিত্বিক চেতনা তথা আত্মপরিচয় গঠনে বধূটি যে সামাজিক মূল্যবোধ নয়, মনুষ্যত্বকেই প্রাধান্য দেবে— তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার সাহসী প্রথাভাঙা মন্তব্যেই। পাশাপাশি, অনাগত সন্তানের যে নামকরণ সে করে, তাতে তার মধ্যে সামগ্রিকতায় নিম্নবর্গীয় স্বার্থের প্রতি সহমর্মিতাও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গ্রামসির মতাদর্শে স্পষ্টতই বলা হয়েছিল, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে শ্রমিকশ্রেণি তথা নিম্নবর্গের নিজস্ব সাংস্কৃতিক আদর্শগত প্রভাবের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা প্রয়োজন— তবেই রাজনৈতিক আধিপত্যের জমি প্রস্তুত হবে—

> আধুনিক কালে শ্রমিকদের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের ও গির্জার *(ভারতীয় ক্ষেত্রে উচ্চবর্গ-পোষিত ধর্মীয় রীতিনীতির)* কালচার থেকে চিন্তার জগতে নিজেদের মুক্ত করা এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে তা' উৎপীড়িত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীস্তরসমূহকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারে।[২৬]

সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক অধীনতার অন্ধকার ঠেলে আফ্রিকায় স্বাধিকারের যে সূর্যোদয় ঘটতে শুরু করেছিল ষাটের বছরগুলিতে, তাতে 'কালো মানুষের মুক্তি'-র যে বার্তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তার প্রভাবে অঙ্কুরিত

হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ত অত্যাচারিত এক 'কালো' বাঙালি বধূর মুক্তির রঙিন স্বপ্ন। যে নবজাতকের আগমনবার্তা তাকে প্রতিবাদে উন্মুখ করে তুলেছে—সেই জাতক তো আসলে তারও আত্মিক মুক্তিরই প্রতীক। এখানেই নিতান্ত একটি অজাত মানবশিশু আফ্রিকার নিপীড়িত জনতার মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে, এক সর্বব্যাপী বিপ্লবী চেতনা তথাকথিত শ্রেণিসংগ্রামের যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা ছাপিয়ে সমাজ-সম্পর্কের প্রতিটি যুগ্মকে প্রবেশ করে, এবং মানবসমাজকে প্রস্তুত করে এক সার্বিক মুক্তির জন্যে—যেটি, মার্কসের মতে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত— "যতক্ষণ না বিপ্লবী গতিধারা জাতির ব্যাপক অংশকে জাগাতে পারছে, শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যবর্তী কৃষক ও পাতি বুর্জোয়া জনগণকে, এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে যাতে তারা শ্রমিকশ্রেণীকেই তাদের মুখপাত্র বলে ধার্য করে তাঁর সঙ্গে গ্রথিত হচ্ছে, ততক্ষণ... (শ্রমিকরা) বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারছে না।"[২৭] সুভাষের কবিতায় এভাবেই তত্ত্ব আর জীবন ক্রমশ পারস্পরিক অন্যোন্য সম্পর্কে গ্রথিত হয়ে যেতে থাকে।

কালো মেয়ের জীবনযন্ত্রণা সুভাষের কবিতায় বারেবারেই উঠে এসেছে। তার অন্যতম কারণ হয়তো এই, যে, তাঁর মা ছিলেন 'মেঘবর্ণ'। আত্মজৈবনিক রচনা 'আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন'-এ তাঁর মাকে গাত্রবর্ণের কৃষ্ণত্বের জন্য শ্বশুরবাড়িতে এক ধরনের চাপা গঞ্জনা বা বৈষম্যমূলক ব্যবহারের শিকার হতে হয়েছিল—এ-কথার উল্লেখ করতে দেখা যায় সুভাষকে। 'কাল মধুমাস' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতাটির পঞ্চম পর্বেও সেই অপমানের উল্লেখ পাওয়া যায়—

মা বলতেন : শুনে নে লিখিস্—

পাল্‌কি এসে পৌঁছুল দেউড়িতে
সে পেয়েছে শিবতুল্য বর
বুকের ভেতর ক'রে আনা
আশা তার মেলে দেবে ডানা—
আলো এল, ঘোমটাও সরালো
কে যেন ককিয়ে উঠল : কালো!
দাঁতে দাঁতে কড়মড় কড়মড়।
সেই থেকে সে রাক্ষসপুরীতে।

('কাল মধুমাস: ৫'/ কাল মধুমাস)

বর্ণনার আধিক্য নেই, কিন্তু নবোঢ়ার আসন্ন জীবনের অজস্র ঘটনার আঘাত-পরম্পরায় অর্জিত ভীতি, বেদনা আর নিরাশার সারটুকু যেন বুঝে নেওয়া যায় এই রূপকথার গল্পের আড়ালে। 'মেজাজ'-এ যে আঘাত-পটভূমিকার ঘটনাবহুল বিবরণ খচিত, উপরোদ্ধৃত স্তবকটিতে তার সার্থকতর রূপায়ন—কারণ এই কাব্যাংশটির ব্যঞ্জনা ঘটনানির্ভর ততখানি নয়, যতখানি ভাবনির্ভর। স্পষ্টতই, সুভাষ ক্রমশ বিবরণধর্মিতার পরিবর্তে বেছে নিচ্ছেন প্রতীকী উপস্থাপন, যা কবিতারই নিজস্ব স্বভাব। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক'-এও কালো মেয়ের বিবাহ-যন্ত্রণার উল্লেখে সুভাষ ঘটনাবিস্তার নয়, প্রাধান্য দিয়েছেন প্রতীকী রূপায়নকেই। ১৯৪৮ সালের প্রথম খসড়ার পর ১৯৫৬ সালে পূর্ণাঙ্গতায় রূপায়িত, নাতিদীর্ঘ এই কবিতাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে গল্পের ভিতর গল্প বলার কৌশল। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গার একাদিক্রমিক আগুনে পুড়ে গিয়েছে যে কলকাতা, এই কবিতা তাকেই গ্রহণ করেছে প্রেক্ষাপট হিসেবে। "আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে/ তারপর খুলে—/ মৃত্যুর

কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে/ তারপর তুলে—" ('ফুল ফুটুক না ফুটুক'/ ফুল ফুটুক) চলে গিয়েছে যে দিনগুলি, তাদের উল্লেখেই কবিতার অন্তর্নিহিত ভাববলয়টির আদড়াটি নির্মিত হয়ে উঠতে থাকে। জীবনের ব্যাপ্ত পরিসীমায় সুখ আর দুঃখ যে চক্রবৎ আবর্তিত হয়, তাদের উচ্চাবচতাকে মেনে নিয়েই যে বেঁচে থাকার নিরাশাকরোজ্জ্বল প্রক্রিয়াটি চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়—তারই বার্তা দিয়ে যায় এই পঙ্‌ক্তিগুলি। বসন্তের আগমন তাই ফুল ফোটার মত কোনো একমাত্রিক প্রকল্পের ফসল হতে পারে না। আসলে বাহ্যত, কবিতার উদ্দিষ্ট সময়ে বসন্তের আগমনের সমস্ত পথগুলিই রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, রিক্ত প্রাণের বেদনা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি প্রকৃতি কিংবা সমাজ। 'গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে' কোকিল-ডাক ডেকে যাওয়া হরবোলা ছেলেটির মৃত্যু যেন মদনভস্মের সমতুল্য হয়ে ওঠে এ-কবিতায়, যা প্রতীকীভাবে অন্বিত থাকে 'কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে'-টির বিবাহ-সংঘটনের ব্যর্থতার সঙ্গে। প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ে, সাদার্ন অ্যাভিনিউ তৈরি হয়ে ওঠার আগে সেই রাস্তার মুখে থাকা এক ফুর্তিবাজ বাঙালি ক্যাপ্টেনের বাড়িতে নেহাতই মস্করার জন্যে রাস্তা থেকে ধরে আনা পাগলাটে গোছের যে নেপালি হরবোলা ছেলেটিকে দেখেছিলেন কবি—কবিতায় সে প্রকৃতির খেয়ালখুশির প্রতীক হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি তার মৃত্যু পরিস্ফুট করে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে নিরর্থক প্রাণবিনষ্টির নির্মম পরিসরটিকেও। সে বেঁচে ছিল যখন, তখন বিকেলে ছিল কনে-দেখা আলো, আর কোকিলের ডাকে হত বসন্তের আবাহন— যে বসন্ত মিলনের ঋতু। বাঙালি পরিবারে কালো মেয়েদের বিবাহ-সংঘটনকে প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই ফেলা হয়— তবু যেন যুদ্ধ-পূর্ববর্তী যে সময়ের উৎফুল্লতার প্রতীক হয়ে আসে হরবোলা ছেলেটি, তখনো পর্যন্ত কালো মেয়েটিও নিজের বিয়ের সম্ভাবনায় বিশ্বাস রাখত। সামগ্রিকভাবেই যে মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস তখনো টলে যায়নি মানুষের—হয়তো এই বিবাহ-আশ্বাসে তারই ইঙ্গিত দিয়ে যান কবি। কিন্তু যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, কালোবাজারি, মন্বন্তরে অন্ন-বস্ত্রের তীব্র অভাব মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। সুস্থ-সুন্দর-স্বাভাবিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল যে বাঙালি সমাজ— তারই রূপায়ন ঘটেছে যেন এই কবিতায় কৃষ্ণাঙ্গী অনূঢ়া মেয়েটির স্মৃতিচারণায়, যেখানে দূরবর্তী ভবিষ্যতেও নিজের জীবনে বসন্তের আগমনের কোনো সম্ভাবনা-সূত্র দেখতে পায়না সে। কিন্তু আসল গল্পটা শুরু হয় এরপর—

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ। (ঐ)

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠি তো তেল-সিঁদুরমাখা বিয়ের আমন্ত্রণপত্রেরই নামান্তর, কিন্তু সে আকাশের ছোঁয়া পায় না মেয়েটি— জানালার গরাদে আটকানো তার আধো-অন্ধকার জীবন। রেলিঙে বুক-চেপে ধরার ছবি প্রতীকী তাৎপর্যে সেই গরাদমুক্তির বার্তাবহ হতে পারে, আবার বাস্তব অনুষঙ্গে দেহপসারিনীর চিহ্নায়কও

হতে পারে—প্রসঙ্গক্রমে সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের অন্ত্যপর্বে দেহপসারিনী 'ধনিয়া'র জানালার গরাদে বুক-চেপে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটির উল্লেখ করা যায়। আসলে বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর-উদ্বাস্তুজীবন বহু ভদ্ররমণীকেই দেহোপজীবিনীতে পরিণত করেছিল—যাদের আজন্মের ঐতিহ্য আর সংস্কার বিসর্জন দিয়ে অর্থোপার্জনের জন্য একমাত্র সম্বল-স্বরূপ বিশুষ্ক দেহটিকেই পণ্যায়িত করে দিতে হয়েছিল। ফুটপাথের উপরে জানালায় বুক-চেপে দাঁড়ানো কিংবা সরাসরি ফুটপাথেই এসে দাঁড়ানো শুষ্কদেহ রমণী আর ফুটপাথে গজিয়ে ওঠা 'কাঠখোট্টা গাছ' কি এই সূত্রেই সমীভূত হয়? বস্তুত, সাক্ষাৎকার-সূত্রে সুভাষ জানিয়েছিলেন, 'একটি বিষণ্ণ আইবুড়ো উদ্বাস্তু মেয়ের ছবি'[২৮]-ই ছিল এই কবিতার মূল বিভাববিন্দু। দেহপসারিনী হোক বা না-হোক, নির্মম কালবেলার আঘাতে যার জীবনের সকল পুষ্প-সম্ভাবনার মূল শুকিয়ে গিয়েছে, সেই কৃষ্ণাঙ্গী বিষণ্ণ অনূঢ়ার বিশুষ্ক দেহে আর ততোধিক অনার্দ্র মনে আবার কখনো বসন্তের পদপাত ঘটতে পারে— এ-ধারণা পোষণ করাও হয়তো বাহুল্য হয়ে উঠেছিল মেয়েটির নিজের কাছেই। তবু প্রজন্মলালিত চিহ্নায়ন-সূত্রে গায়ে প্রজাপতি উড়ে এসে বসলে আসন্ন বিবাহ-সম্ভাবনায় তার শরীরে 'হর্ষবিষাদের শিহরণ জাগে'। এই 'হর্ষবিষাদ' যে কীভাবে সমসময়ের গণমনোভাবেরই প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল— তার বিবরণ পাওয়া যায় সুভাষের নিজেরই বয়ানে—

> এর (এই কবিতার) মধ্যে একটা যেমন বেদনা আছে, যেমন একটা কালো মেয়ের কথা আছে— আইবুড়ো কালো মেয়ে, দেখতে ভালো নয়। এটা, যারা বাংলাদেশে বড় হয়েছে, গ্রামে থেকেছে, মফস্বলে থেকেছে, তারা এ কালো মেয়ের যে বেদনা সেটা জানে। এবং তার গায়ে প্রজাপতি উড়ে এসে বসলে যে আশা জাগে এবং পরক্ষণেই সে আশা যে পূরণ হবে না একথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় তার যে আশাভঙ্গ, এ সমস্ত কিছু আশা, আশাভঙ্গ, এবং তা সত্ত্বেও ফুল না ফুটলেও বসন্তের জেগে ওঠা— এটা কোনো ব্যক্তিজীবনের নয়, হয়তো সেই সময়ের খানিকটা প্রতিচ্ছবি এ কবিতায় পড়েছিল।[২৯]

বাহ্যত ফুল ফোটাবার পরিবেশ না থাকলেও আভ্যন্তরীণ প্রেরণায় মদনসখার আগমন হতে পারে— কবি সুভাষের তাই প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা যেন এ-কবিতায় পরিস্ফুট হয়। ক্রমিক নিরাশা মনকে ক্রমশ অসংবেদী করে তোলে, নিত্যনতুন আঘাত সে মনে আর কোনো তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগায় না। কিন্তু আকস্মিক আশার হাতছানি সে মনকে উদ্‌বেজিত করে তুললে পরমুহূর্তের নিরাশার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে ওঠে। গায়ে প্রজাপতি উড়ে আসায় যে অসম্ভাব্য আশার আলো তাৎক্ষণিকভাবেও মেয়েটিকে উত্তেজিত করে তুলেছিল, তার প্রতিক্রিয়াতেই 'দড়াম করে দরজা বন্ধ' করে সে— কারণ এই ঘটনা তার জীবনের আশাহীনতার বেদনা আরও স্পষ্টতায় প্রতিভাত করে তোলে তার নিজের কাছেই। তবু আশা মরে না, লজ্জারুণ প্রেরণায় নতুন জীবনের স্বপ্ন তাকে আবার একবার বাঁচতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে হয়তো। শান-বাঁধানো ফুটপাথের আদ্যন্ত বিরুদ্ধতাতেও দড়িপাকানো গাছে কচিপাতা আসতে পারে— প্রকৃতির এই বাধা-অতিক্রমণের সগর্ব ঘোষণায় মানুষিক প্রবণতার অদম্য স্বরই ধ্বনিত হয় যেন। যে অন্ধকার দিন চলে গিয়েছে, তা যেন আর না ফেরে— এই আকাঙ্ক্ষাতেই বসন্তের আগমনের ইঙ্গিত ঘোষিত হতে থাকে, আর অব্যবস্থা থেকে সুস্থিতির দিকে যাত্রার সেই আবেগই হয়তো শ্রমিক আন্দোলন-শিক্ষক আন্দোলন-ট্রামভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন-উদ্বাস্তু আন্দোলনে জেরবার কলকাতার ক্রমশ আত্মস্থ হয়ে ওঠার সদিচ্ছার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। বস্তুত, কোনো একটি সুবর্তুল নিটোল গল্পের অবয়ব নয়, যাপিত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু অনুষঙ্গ জুড়ে 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতাটিতে গল্পের একটি আদল খাড়া করে তোলেন মাত্র কবি—সেখানে আদি-অন্ত্য-সমন্বিত একমুখিনতার

পরিবর্তে প্রাধান্য পায় ঘটনার আভাসে ভাবের উৎসরণ, গল্পের মুখরতার পরিবর্তে কাব্যিক নীরবতায় বাচ্যাতিশায়ী ব্যঞ্জনার সঞ্চার ঘটে।

গল্পের অনপনেয় বিস্তার কবিতায় অর্জিতব্য নয়, কারণ কবিতা প্রায় নিরূপায়ভাবেই বিস্তারমুখ্য নয়, ভাবমুখ্য— যে ভাবের স্ফূরণ সর্বথা মৌহূর্তিক, দীর্ঘসঞ্চারী নয়। হয়তো একারণেই দীর্ঘকবিতা কবিতা-হিসেবে কতখানি সার্থক—তাই নিয়ে তৈরি হয় বিতর্কের পরিসর। গল্পের খুঁটিনাটির বদলে কবিতায় তাই প্রধান হয়ে ওঠে স্বল্পতা আর সংহতির সাধনা— আর সেই সাধনার উপায় হয়ে ওঠে প্রতীকের সার্থক ব্যবহার। গল্পের গোটা চেহারা নয়, কেবল তার ঘটনাপরম্পরার উপজাত প্রভাবটুকুকেই যদি সফলভাবে ধরা যেতে পারে কবিতায়, তবেই গল্প রূপান্তরিত হয় সার্থক কবিতায়। গল্পের মূর্ততা কবিতায় বিমূর্ত হয়ে ওঠে, ঘটনার আভাসমাত্র রেখে অথবা না-রেখেও সেখানে আখ্যানের বীজটুকু খুঁজে নিতে পারে পাঠক, আর তাতেই একাধারে 'গল্প শোনা'-র চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাপূরণ আর কবিতার কাঙ্ক্ষিত রসস্ফূর্তির সম্মিলন ঘটে যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এভাবেই গল্প নিজের স্থান খুঁজে নেয়— আর সেই গল্পের প্রয়োগ একাধারে তাঁর আত্মজৈবনিকতায়, জনদরদী মনের প্রকাশে, রাজনৈতিক সচেতনতার স্ফূর্ততায় এবং সর্বোপরি, বিমূর্ততার রূপায়নে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, নির্মল। (সম্পাদিত)। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯০।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ১৯৫।

৩. মিত্র, হরপ্রসাদ। কবিতার আকাশ, পৃথিবীর মাটি। 'কবিতার বিচিত্র কথা ও রবীন্দ্র-সমকালীন বাংলা কবিতার ধারা'। কথামালা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২১-২২।

৪. Poe, Edgar Allan, *Essays and Reviews,* New York City, Library of America, 1984, p. 573

৫. সিকদার, অশ্রুকুমার। কাব্যনাট্য ও তার ভাষা। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আধুনিক কবিতার ইতিহাস। দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৩৪১-৪২।

৬. সিকদার, অশ্রুকুমার। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ২৬৩।

৭. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। সময়ের জালে: কবিতার কাঠগড়ায়। কবিতার বোঝাপড়া। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১৭০-৭১।

৮. সাহা, দিলীপ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবন ও সৃজন। ফুয়াদ, আফিফ। (সম্পাদিত)। দিবারাত্রির কাব্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৪৭৯।

৯. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। সময়ের জালে। কবিতার কাঠগড়ায়। 'কবিতার বোঝাপড়া', ঐ, পৃ. ১৬৮-১৭০।

১০. সিকদার, অশ্রুকুমার। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়', ঐ

১১. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। চাই আস্ত মানুষ। কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা/উত্তর। কবিতার বোঝাপড়া। ঐ, পৃ. ১৪৯।

১২. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। সময়ের জালে। কবিতার কাঠগড়ায়। কবিতার বোঝাপড়া। ঐ, পৃ. ১৭০।

১৩. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। সোনালী সুতোর পাকে পাকে। ডাকবাংলার ডায়রী। 'গদ্যসংগ্রহ' প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ১৯৮।
১৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। এক হাতুড়ের জবানবন্দী। সালেমনের মা। কবিতার বোঝাপড়া। ঐ, পৃ. ১৬৬।
১৫. রায়, অজিত। আন্তোনিয়ো গ্রামসি। জীবন ও তত্ত্ব। সেরিবান, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৭৬।
১৬. রায়, অজিত। আন্তোনিয়ো গ্রামসি। জীবন ও তত্ত্ব। ঐ, পৃ. ৭৮।
১৭. গুহ, দিলীপ। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলন (১৯৪৭-৬২)। অনিল আচার্য সম্পাদিত। তিন দশকের গণআন্দোলন। অনুষ্টুপ, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১১১।
১৮. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। বজবজের যে-কোনো সকাল। যখন যেখানে। গদ্যসংগ্রহ প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১১০।
১৯. রায়, অজিত। আন্তোনিয়ো গ্রামসি। জীবন ও তত্ত্ব। ঐ, পৃ. ৭৭।
২০. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। বাবর আলির চোখের মত। যখন যেখানে, গদ্যসংগ্রহ। ঐ, পৃ. ১১৬।
২১. সিংহ, বিজয়। কবিতার নেপথ্য। সন্দীপ দত্ত সম্পাদিত। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ. ১৯
২২. সিকদার, অশ্রুকুমার। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়। ঐ
২৩. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। সোনালী সুতোর পাকে পাকে। ডাকবাংলার ডায়রী। গদ্যসংগ্রহ। ঐ, পৃ. ১৯৯
২৪. ঐ
২৫. সিকদার, অশ্রুকুমার। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়। ঐ
২৬. রায়, অজিত। দ্র. আন্তোনিয়ো গ্রামসি: জীবন ও তত্ত্ব। ঐ, পৃ. ৭৮
২৭. ঐ, পৃ. ৭৫
২৮. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। ফুল ফুটুক না ফুটুক: কবির সঙ্গে লোথার লুৎসে। কবিতার বোঝাপড়া, ঐ, পৃ. ১৫২
২৯. ঐ, পৃ. ১৫৫

আকর গ্রন্থ:

১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'কবিতা সংগ্রহ' ১। চতুর্থ সংস্করণ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০২১।
২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'কবিতা সংগ্রহ' ২। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৩।